বৃক্ষ প্রেমিক

সুজা সরকার

আজ নববর্ষের প্রথমদিনে আমার বাসায় খাবারের মেনুতে আছে পুঁই শাক দিয়ে চিংড়ি মাছ। বাংলাদেশের রূপচান্দার শুটকি ভর্তা, মসুরের ডাল দিয়ে সজ্‌নে ডাটা এবং গরুর মাংস দিয়ে বাংলাদেশী লাউ। এখানে বাংলাদেশী লাউ সম্পর্কে কিছু না বললেই না। কারণ আজ থেকে বছর দশেক আগে সিডনীতে বাংলাদেশের লাউ এর কথা কল্পনাও করা যেত না। এখন প্রায় বাংলাদেশী গ্রোসারী সপে সিজন এলে লাউ, বাংলাদেশী সীম, লাল শাক, কচুর ডগা, করলা সহ আরও অনেক বাংলাদেশী শাকশবজি পাওয়া যায়। উস্থা (ছোট কড়লা) ভাজি এবং ছোট চিংড়ি দিয়ে কচুর লতি আমার প্রিয় খাবারের মধ্যে অন্যতম।

প্রতিবেদক খান বাড়ীর সদর দরোজায়, পেছনে আমের ঝাঁকি নিয়ে বৃক্ষকুল

সিডনীতে বাংলাদেশী বীজ সংগ্রহ করে এসব চাষাবাদের যে পুরধা ব্যক্তিত্ব তিনি আমাদের অনেকেরই পরিচিত খান ভাই, পুরো নাম আবুল বাশার খান। পাকিস্থান আমলে পূর্বাংশে খান পরিবারের বেশ কদর ছিল বলে শুনেছি। কিন্তু এখন আছে কিনা তা আমার জানা নেই। না জানারই কথা কারণ ১৭ বৎসর পার করে দিলাম সিডনীর অলিতে গলিতে। মনে পড়ে কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে ছোটবেলায় গ্রামের বাড়ীতে নানী কিংবা দাদী বাড়ী বেড়াতে যেতাম ঢাকা থেকে। তখন পৌষের সকালে খড়ির চুলোর পাশে, চাদর গায়ে চাপিয়ে হাত তাপাতে তাপাতে গরম ভাপা পিঠা অথবা পুলি পিঠা কিই না মজা করে খেতাম। এখন এই মধ্যবয়সে সেই স্মৃতিগুলো ধুসর হলেও নিভু প্রদীপের মতো মাঝে মাঝে তা আবার উজ্জল হয়ে ওঠে। এখানে ইদানিং বাংলাদেশী গ্রোসারী দোকানগুলোতে ভাপা পিঠা বিক্রি হয়। ওগুলো ঠান্ডা হয়ে থাকে। গ্লাড র‍্যাপ দিয়ে মোড়ানো, বোঝার উপায় নেই কয়দিনের বাসী পিঠাগুলো। তবুও স্মৃতী রোমন্থনের খড়গে নিষ্পেষিত প্রবাসী জীবনে পিঠা খাওয়ার লোভ আমি সামলাতে পারি না। তাই সেই পিঠা কিনে এনে ঘরে মাইক্রোওয়েভে গরম করে যখন খাই, তখন মনে পড়ে আমার হারিয়ে যাওয়া দাদী,

নানীর কথা,আমার মায়ের কথা- আমার বাংলা মা'য়ের কথা। মনে পড়ে প্রয়াত কবি সুফিয়া কামালের কবিতার অংশ ---

পৌষ পার্বনে পিঠা খেতে বসে
খুশীতে বীষম খেয়ে
আরো উল্লাস বাড়িয়াছে মনে
মায়ের বকুনী পেয়ে . . . . . .

ইংরেজী নববর্ষের শুরুর দিনটি প্রবাসী বাংলাদেশীরা প্রায় ঘটা করে সব বিদেশী খাবারের আয়োজন করে তাদের বাসায়। কিন্তু আমি এবং আমার সহধর্মীনী এই দিনটিতে বিশেষভাবে বাংলাদেশী খাবারের আয়োজন করে থাকি। তারই আয়োজন হিসেবে গরুর মাংসের সাথে আলুর পরিবর্তে লাউ দিয়ে রান্নার ব্যবস্থা হলো। আর এই কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের মূল নায়ক আমাদের শ্রদ্ধেয় বাশার ভাই। সাত-সকালে ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে ফোন করলেন তিনি এবং সেই সাথে আমন্ত্রণ জানালেন এবছরের তার ফলানো গাছের প্রথম লাউটি তিনি আমাকে দেবেন।

বৃক্ষপ্রেমি আবুল বাশার খান দেশী আম গাছের সাথে

বললাম, শুনেছি বাংলাদেশের সাধারণ ধর্মপ্রেমি কৃষকেরা তাদের গাছের প্রথম লাউ হয় মসজিদের ঈমাম সাহেবকে অথবা মাজারের পীরসাহেবকে দিয়ে থাকে। এখন আপনি কি মনে করে আপনার গাছের প্রথম লাউ আমাকে দেবেন? উত্তরে বললেন, ইমাম বলেন আর পীর বলেন, আপনাকে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাড়াতাড়ি চলে আসেন। অগত্যা তার অনুরোধের ঢেঁকি আমাকে গিলতেই হলো।

এবার আমি এই বৃক্ষ প্রেমিক মানুষ বাশার ভাই এর কথায় আসি। সিডনীতে ঘর-সংসার গোছাতেই প্রবাসীদের দিনের সিংহভাগ ফুরিয়ে যায়, তার উপরে বৃক্ষসেবা! ভাবাই যায়না। কিন্তু বাশার খান সকলের ব্যতীক্রম। তার বাসায় গাছের সমারোহ মুগ্ধ করে সবাইকে। বাসার প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকতেই হাতের বাঁ দিকে সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে আছে আম, পেয়ারা, ডালিম, কমলা (ম্যান্ডারিন) অরেঞ্জ, জামরুল আর হাতের ডান দিকে বুক সমান উঁচুতে দাড়িয়ে আছে

সারি সারি পেঁপে গাছ। তার ছায়ায় মাথাতুলে অহংকার করে দাড়িয়ে আছে সবুজ এবং কালো রং এর বাংলাদেশী কাঁচামরিচের গাছগুলো। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দেখলাম ধরনী'র বুকজুড়ে লেপটে আছে তুলসী পাতা, আদা ও থানকুনি পাতার লতাগুল্ম।

বাড়ীর অন্দর আঙগিনায় প্রবেশ করতেই এপাড় ওপাড় ছড়ানো লাউ এর ঝাকা দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে লাউয়ের মাঁচান দিগন্ত। মনে হচ্ছে শত রমনীর খোঁপায় সারি বেঁধে অতি সযতনে একেকটি করে সাদা ফুল যেন কেউ গুজে দিয়ে গেছে। মাঁচানের নীচ দেখলাম বেশ কয়েকটি লাউ ঝুলে আছে। আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বাশার ভাই, ঐটি গাছের প্রথম লাউ।

অন্দর আংগীনার মাঁচা থেকে খান ভাই লাউ কাটছেন

চাক্ষুস এ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বন্চিত করতে চাইনি বলে সাথে আমি আমার দুই মেয়ে তৃনা এবং তৃষাকে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাদের দেখাতে বাংলাদেশে কৃষান বধূরা কিভাবে লাউ কেটে এনে রান্না করে। আমার বড় মেয়ে তৃণা ইয়ার ফাইভ এর ছাত্রী। ওকে বললাম চল মাচার নিচে গিয়ে লাউ কেটে নিয়ে আসি। বাশার ভাই ঘর থেকে একটি কাস্তে নিয়ে এলেন। দেখে আমি অবাক, যে কাস্তে দিয়ে বাংলাদেশে গেরস্থরা ধান কাটে অথবা গো-ঘাস কাটা হয় ঠিক সেই কাঁস্তে! বললাম ঐটা কোত্থেকে এনেছেন? সাবলীল ভাবে উত্তর দিলেন, কেন বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছি। জিজ্ঞেস করলাম এসব গাছ গাছড়ার বীজ যে বাংলাদেশ থেকে এনেছেন, কাষ্টমস বা কোয়ারানটাইন কোন অসুবিধা করেনি? বললেন এখনতো আর আনা সম্ভব না। অনেক আগে তাঁর এক সিডনী প্রবাসী বাংলাদেশী পরিবারিক বন্ধুর কাছ থেকে তিনি এগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। কালের আবর্তে পরিবারটি দেশে ফিরে গেছে। নাইন-ইলেভেনের পর সবকিছু বদলে গেছে। স্ক্যানিং ছাড়া কিছুই আনা যায় না, সিডনী এয়ারপোর্ট তো নয় যেন রাজবাড়ী'র সদর দরোজা।

অনেক দিন আগের কথা, বোধকরি ৯৭-৯৮ এর দিকে আমি তখন সিডনী'র একটি আবাসিক এলাকা রেডফার্নে বসবাস করি এবং সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ে হরটিকালচারে লেখাপড়া করছিলাম।

বিকেল বেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইল্ড কেয়ার সেন্টার থেকে বড় মেয়ে তৃণাকে গাড়িতে উঠিয়ে বাসার দিকে আসার পথে এক বাড়ির বারান্দায় টবে অদ্ভূত বিশ্বয়কর রঙিন ফুল দেখে গাড়ী পার্ক করে বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়লাম। মধ্যবয়সী এক মহিলা দরজা খুলে স্মীতহাস্যে বলল, গুড আফটারনুন-সাথে সাথে আমি দাঁত কয়েকটা বের করে বললাম গুড আফটারনুন। ঘরের ভেতর থেকে শুধু ঘেউ ঘেউ শব্দ পেলাম। সময় নষ্ট না করে নিজের পরিচয় দিয়ে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে বল্লাম,তোমার ফুলের টবে এই অদ্ভুৎ ফুল দেখে তোমার কাছ থেকে জানতে এসেছি তুমি কোথেথকে সংগ্রহ করেছ? এক গাল হেসে জানালো ফুলের বীজ সে গ্রীস থেকে নিয়ে এসেছে। সাথে সাথে জানতে চাইলাম কাস্টম্স এবং কোয়ারিনটিনে কেমন খরচ হয়েছিল। রহস্যময়ী হাসিতে মহিলাটি বললেন 'কাস্টমস ধরতেই পারেনি কারন বীজগুলো কিছুটা জামার বোতামের মত তাই আমি যে শার্ট পরে এসেছিলাম সেটার অরিজিনাল বোতাম ফেলে দিয়ে ফুলের বীজ দিয়ে বোতাম বানিয়ে নিয়ে এসেছি' বলেই আবারও তিনি হাসতে লাগলেন। আমি বললাম তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। সেও বলল ধন্যবাদ। আজ এতদিন পরে বাশার ভাই এর বাগানে দাড়িয়ে মনের মধ্যে একপলক চমকে গেল আরেকটি খন্ড স্মৃতী। স্কুলের পরীক্ষার খাতায় কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্থের ডেফোডিল কবিতার সারমর্ম লিখতে গিয়ে আমি লিখেছিলাম, **'নেচার গিভস আস্ ডাবল্ প্লেজার, হোয়েন উই এনজয় দ্যাম এন্ড হোয়েন উই রিফলেক্ট দ্যাম।'**

ল্যাকেম্বায় তাঁর বাড়ীর সদর আঙগিনায় জামরুল ও কমলা গাছ

তারপর লাউ এর মাচার তলে আমি লাউটাকে ধরলাম। আমার বড় মেয়ে ঘাস কাটার কাঁচি দিয়ে লাউ-এর ডগাটা কাটলো। তার খুশী দেখে আমার মনে হলো লাউ কেটে সে রবার্ট ব্রুসের মত দিগ্বিজয় করে ফেলেছে।

এর পরই বাশার ভাই আমন্ত্রণ জানালেন বাগানের দক্ষীন প্রান্তে। বললেন ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিনটিতে ২৭০ (দুই শত সত্তুর) ডলার দিয়ে চারটি গাছের চারা কিনে এনেছি। শুনে

আমার চোক্ষু চড়ক, কারন এ পরিমান ডলার দিয়ে সিডনীতে চার সদস্যের মাঝারি একটি বাংলাদেশি পরিবারের দিব্যি দেড় হপ্তা থাকা-খাওয়া হয়ে যায়। আর তাই কিনা উনি সাধানর বৃক্ষের জন্যে খরচ করলেন! যাহোক, গাছের চারাগুলো দেখলাম আপেল, নাশ, চেরী ও ব্ল্যাক প্লাম। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আগ্রহ করেই আমি ওগুলো নেড়ে চেড়ে দেখলাম, নয়ত বোঝাব কি করে যে আমি একজন কৃষিবিদ।

এরপর একে একে তিনি তার বাগানের অন্যান্য বৃক্ষগুলোর সাথে আমাকে একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন, যেন ওগুলো তার সন্তান। যে কয়টা বৃক্ষের নাম আমার মনে আছে সেগুলো হলো জাম্বুরা, কাগজীলেবু, কুলবড়ই, অষ্ট্রেলিয়ান পেয়ারা, চেরী, ডালিম, আনারস, গোল আলু, মিষ্টি কুমড়া, গোল বেগুন, লম্বা বেগুন, পাটের শাক, রেড স্পিনিচ, বরবটি, মুখকিচু আরও কত কি।

অদম্য বুনো লতার মতো ছেয়ে আছে লাউ গাছ

উপসংহারে বাশার ভাইয়ের সম্পর্কে আরেকটি কথা না বললেই নয়। সদাহাসি খান ভাই একজন অজাতশত্রু। মধ্য-পশ্চিম আবাসিক এলাকা ল্যাকেম্বা'র খান ভাইকে চেনেনা এমন বাংলাদেশী সিডনীতে বিরল। ঢাকঢোল পিটিয়ে রাষ্ট্র করেও বৃহত্তর সিডনী থেকে একজন বাংলাভাষীকে খুঁজে পাওয়া যাবেনা যিনি 'খান ভাইকে' অভিশম্পাত দেবেন। এ যোগ্যতা ও সার্বজনীন বিশ্বাস তিনি জন্মগতভাবে অর্জন করেছেন বলে অনেকে মনে করেন। কথিত আছে, প্রবাসে

একমাত্র কন্যা এমি'র সাথে বশর খান তার বাড়ীর অন্দর আঙগিনায়

বাংলাদেশীরা কোথাও কোন বিপদে পড়লে কেউ না যাক কিন্তু নিজের কাজ-কর্ম ফেলে খান-ভাই ঠিকই দৌড়ে যাবেন। এ মহানুভব ব্যক্তিটির জন্ম বাংলাদেশের পটুয়াখালী, বাউফল এর ইন্দ্রকুল গ্রামে। বাবা চাষাবাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। চার বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হোন। একদিন সাঁঝের বেলায় ১১ মাস বয়সি ছোট ভাইটিকেও মৃতাবস্থায় মায়ের কবরের উপরে তিনি আবিষ্কার করেন। বুকজুড়ে সেই থেকে তার চীর হাহাকার। সবার মাঝে আজো তিনি তার সেই হারানো ভাইটিকে খুঁজে বেড়ান।

তারপর সৎমায়ের ছায়ায় লালিত পালিত হয়ে বেড়ে উঠেন খান ভাই। স্নাতক পরীক্ষার ফলাফল না জেনেই মাত্র এক-কুড়ি বয়সে ১৯৮৭ সালে সত্যেন সেনে'র সেয়ানা গল্পের নায়ক ঝোড়ুর মতো ঘরছাড়া হন ভাগ্যোন্বেষনে। ভারত, নিউজিল্যান্ড এবং এ ঘাট ও ঘাট ঘুরে নানা অভিজ্ঞতা সন্চয় করে শেষাব্দি জাপান থেকে অষ্ট্রেলিয়ায় এসে স্থায়ীভাবে নোঙর ফেলেন তিনি। ইমিগ্রেশনের কঠিন আইনের মারপেঁচের ছিদ্রপথে তিনি এখন অষ্ট্রেলিয়ার নাগরিক এবং দুই সন্তানের জনক। খান ভাই গর্বিত ব্যবসায়ী এবং একজন নিবেদিত বাংলাদেশি সমাজকল্যান কর্মী। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচিয় তিনি একজন বৃক্ষ প্রেমিক, যার হৃদয় ভরা শুধু স্নেহ আর শ্বাশ্বত ভালোবাসা। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু বেঁচে থাকলে তার 'বৃক্ষে প্রান' আবিষ্কারের গবেষনায় হয়তবা বাশার খান হতেন তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন একজন সহযোগী যেমনটি হয়েছিলেন অখ্যাত তেনজিং হিমালয় শির্ষ জয়ী এডমন্ড হিলারীর সহযাত্রী।

সুজা সরকার ,সিডনী, ০১/০১/০৬ ইং